ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 985-990
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.094

নব্য-ন্যায়ের দৃষ্টিতে পদশক্তি: একটি দার্শনিক সমীক্ষা

সৌরভ মজুমদার, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2025; Accepted: 25.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The discussion of Pada and padartha is an important topic of Neo-Nyaya philosophy. Although we can get the etymological idea of Pada and padartha from the level of grammar, the explanation of how a Pada can refer to a specific padartha and why any Pada cannot refer to any padartha remains a foggy one. But in Indian philosophy, especially in Neo-Nyaya philosophy, following all the rules of grammar, a complete and evaluative discussion of this can be found. However, the power by which a particular Pada can refer to a specific padartha will be the refuge of the byakti? Or the jati? Or the akrti? Or the jatyakrtibisistabyakti? Different sects hold different opinions on this matter in Indian philosophy. However, although all these opposing opinions are mentioned, without prolonging the subject by discussing them in detail, the present article has mainly presented the opinion of the jatisaktibadi Mandan Mishra as the purbapaksi and the opinions of the Neo-Nyaya Jagadish Tarkalankar and Vishwanath Nyayapanchanan as the sid'dhantapaksoi.

Key Words: *Pada, padartha, Aptabakya, Vrtti, sakti, saktigraha, byakti, jati, jatyakrtibisiṣṭabyakt.*

ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তিকাল সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করেই যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল, এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। বেদ ভারতের প্রাচীন এবং কারা বেদ রচনা করেছেন-সেই বিষয়টি নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি। বেদকে সকল সময়ই শাশ্বত এবং অপৌরুষেয় বলেই বিশ্বাস করা হয়েছে। বস্তুতঃ, ভারতীয়দের বিশ্বাস, কোন মানুষ বেদে রচনা করেনি, বেদ স্বয়ং ব্রহ্মের বাণী। তাই বেদের প্রামাণ্য স্বীকারের ভিত্তিতেই ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেনিতে ভাগ করা হয়, যথা- আস্তিক এবং নাস্তিক। উল্লেখ্য যে, 'আস্তিক' এবং 'নাস্তিক'-এই শব্দ দুটিকে এখানে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আস্তিক বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক বলতে বুঝি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আস্তিক বলা হয়েছে তাদের যারা বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বেদের সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে। সুতরাং কোন দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে যদি বেদে বিশ্বাসী হয় তাকে আস্তিক বলা হবে। অপরদিকে, ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সেগুলিই নাস্তিক যেগুলি করে না। এই বিভাগ অনুসারে সাংখ্য এবং মীমাংসা দর্শন যদিও জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, তবু এই উভয় দর্শনকে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু উভয় দর্শনই বেদে বিশ্বাসী এবং বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়। আর এই আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম একটি হল ন্যায় দর্শন। এই ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি গৌতম। ন্যায় দর্শন প্রধানতঃ যথাযথ জ্ঞান লাভের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ কি উপায়ে বা কোন্ কোন্ বিধি অনুসরণ করে যুক্তিতর্ক করলে আমরা যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারি, ন্যায় দর্শন প্রধানতঃ তারই আলোচনা করে। এই ন্যায় দর্শনে জ্ঞানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে-'প্রমা' বা যথার্থ জ্ঞান এবং 'অপ্রমা' বা অযথার্থ জ্ঞান। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলতে

বোঝায় বিষয়ের যথার্থ অনুভব। কোন বিষয়ের যে গুণ, সেই গুণ জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যথাযথ আছে, এইরূপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। যখন আমরা কোন ঘট প্রত্যক্ষ করি এবং জানি যে বস্তুতঃ ঘটের মধ্যে ঘটত্ব বর্তমান, তখন আমাদের জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যে যে গুণের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নেই, কোন বস্তুতে সেই গুণ যখন আমরা জানি, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ। যখন আমরা রজ্জুতে সর্পের গুণ উপলব্ধি করি, যা প্রকৃতপক্ষে রজ্জুতে নেই, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান।

নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ চার প্রকার প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Comparison) এবং শব্দ (Testimony)। প্রত্যক্ষ হ'ল বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান। কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান। প্রত্যক্ষকে নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা-লৌকিক (Ordinary) ও অলৌকিক (Extra-ordinary)। লৌকিক প্রত্যক্ষ আবার দু'প্রকার; যথা- বাহ্য এবং মানস। অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার; যথা-সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ তাকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। আত্মা মন রূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে, একে বলা হয় মানসপ্রত্যক্ষ। লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ ঘটে।

ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত চারটি প্রমাণের মধ্যে চতুর্থ প্রমাণ হল শব্দ প্রমাণ। নৈয়ায়িকদের মতে, শব্দ হ'ল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আপ্তবাক্য। শব্দের প্রকৃত অর্থ যিনি অবহিত, যিনি জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য-তিনিই শব্দতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনিই আপ্ত। অন্নংভট্টের মতে, শব্দ প্রমাণের লক্ষণ হল –

"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ"[১]

অর্থাৎ আপ্তব্যাক্তির উপদেশ বা বাক্যকে বলা হয় শব্দ প্রমাণ। এখন প্রশ্ন আপ্তব্যক্তি কে হবেন? এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"আপ্তঃ তু যথার্থ বক্তা।"[২]

অর্থাৎ যিনি যথার্থ বক্তা তিনি-ই হলেন আপ্তব্যক্তি। যথার্থ বক্তা বলতে বোঝায় সেই ব্যক্তিকে যিনি ভ্রম(একটি বস্তু যেরূপ তাকে অন্যরূপে জানা), প্রমাদ(অসাবধানতা), বিপ্রলিপ্সা(বঞ্চনা করার ইচ্ছা) ও করণাপাটব(ইন্দ্রিয় ত্রুটি) এই চারটি দোষ শূন্য। এখন প্রশ্ন হল বাক্য বলতে কী বোঝায়? এর উত্তরে ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে-

"বাক্যং পদসমূহ"[৩]

অর্থাৎ বাক্য হল কতকগুলি পদের সমষ্টি। যেমন- 'ঘট' এবং 'আন' -এই দুটি হল পদ এবং এই দুটি পদের সমন্বয়ে গঠিত 'ঘটটি আন" হল একটি বাক্য। পুনরায় প্রশ্ন হয়, পদ কী? এর উত্তরে বলা হয়-

"শক্তং পদম্।"[৪]

অর্থাৎ যা শক্তিবিশিষ্ট তা-ই হল পদ। এই পদ হল পদার্থ নির্দেশক। অর্থাৎ একটি পদ থেকে ঐ পদ নির্দেশিত একটি পদার্থের জ্ঞান হয়। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব শব্দ শ্রবণ করি সেই সব শব্দ থেকে কিন্তু আমাদের শাব্দবোধ হয় না। বরং একটি নির্দিষ্ট শব্দ থেকে একটি নির্দিষ্ট অর্থের-ই বোধ হয়। উল্লেখ্য যে, একটি শব্দ থেকে একটি অর্থের বোধ হলেও যেকোন শব্দ থেকে কিন্তু যেকোন অর্থের বোধ হয় না। যেমন- ঘট, পট প্রভৃতি শব্দ নিজ নিজ একটি নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অর্থকেই বোঝায়। 'ঘট' থেকে পট-পদার্থ এবং 'পট' থেকে ঘট-পদার্থ একজন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষ কখনও বোঝে না। বিশেষ বিশেষ পদ যখন বিশেষ বিশেষ অর্থকেই বোঝাতে সক্ষম, তখন নিশ্চয় এর পিছনে কোন না কোন কারণ নিহিত আছে। এই কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় পদের সঙ্গে পদার্থের একটি সম্বন্ধ আছে যা পদের দ্বারা পদার্থের বোধকে নিয়ন্ত্রন করে। পদ ও পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান এই সম্বন্ধকে বলা হয় বৃত্তি। এই বৃত্তিরূপ সম্বন্ধ দুই প্রকার, এর মধ্যে অন্যতম একটি প্রকার হল শক্তি। এই শক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"শক্তিশ্চ পদেনসহ পদার্থস্য সম্বন্ধঃ।"[৫]

অর্থাৎ শক্তি হল সাধারণ ভাবে পদের সাথে পদার্থের সম্বন্ধ বা শাব্দ বোধের অনুকূল পদ-পদার্থের সম্বন্ধ। সহজ কথায়, বিশেষ বিশেষ পদের সাথে বিশেষ বিশেষ পদার্থের যে সম্বন্ধ তা-ই হল শক্তি। শক্তির স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীগদাধর ভট্টাচার্য বলেন, 'এই পদ এই অর্থ বোধের জনক হোক' অথবা ' এই পদ হতে এরূপ অর্থের বোধ হোক' -এইরূপ

ইচ্ছা-ই হল সংকেত রূপ বৃত্তি বা শক্তি বৃত্তি। প্রাচীন ন্যায় মতে, এই শক্তি হল ঈশ্বরেচ্ছা। কিন্তু নব্যন্যায় মতে, শক্তি হল ইচ্ছা মাত্র। কিন্তু প্রশ্ন হল, পদ জ্ঞান থেকে পদার্থের জ্ঞান লাভের মাধ্যম যে শক্তি জ্ঞান, সেই শক্তি জ্ঞান কীভাবে হয়? এর উত্তরে বলা হয়েছে-

"শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোষাপ্তবাক্যাদ্ ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্য শেষাদ্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ"।।[৬]

অর্থাৎ পণ্ডিতগণের মতে, ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, বৃদ্ধব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি এবং প্রসিদ্ধপদেরসান্নিধ্য -এই আটটি উপায়ে একটি পদের শক্তিজ্ঞান হয়। যেমন- 'ভূ-সত্তায়াম' ব্যাকরণের এই সূত্র থেকে 'ভূ' ধাতুর সত্তা অর্থে শক্তিগ্রহ হয়। দুটি বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে একটি বস্তু বা প্রাণীর অতিদেশ বাক্যার্থের স্মরণের মাধ্যমে উপমান প্রমাণ দ্বারা সম্মুখস্থ অপর বস্তু বা প্রাণীর জ্ঞান হয়। কোষ বা অভিধান থেকে একদন্ত, হেরম্ব, লম্বোদর, গজানন প্রভৃতি শব্দের 'গণেশ' অর্থে শক্তি জ্ঞান হয়। আপ্তবাক্য থেকে 'পিক' শব্দের দ্বারা 'কোকিল' অর্থে শক্তিজ্ঞান হয়। বৃদ্ধব্যবহার থেকে পদ বিশেষের আবাপ ও উদ্বাপের দ্বারা 'গো' পদ থেকে গরু অর্থে শক্তিজ্ঞান হয়। বাক্যশেষের দ্বারা 'যব' পদের দীর্ঘশূকবিশিষ্ট শস্যে শক্তিজ্ঞান হয়। আবার বিবরণের ফলে 'ঘট' পদের কলশে শক্তিজ্ঞান হয়। আর পদের সান্নিধ্যবশতঃ শক্তিজ্ঞান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"ইহা সহকারতরৌ মধুরং পিকো রৌতীত্যাদৌ
পিকশব্দস্য কোকিলে শক্তিগ্রহ ইতি"।[৭]

অর্থাৎ 'ইহা সহকারতরৌ মধুরং পিকো রৌতি' -এই বাক্যের 'সহকারতরু', 'মধুর', 'ডাকা' -এই তিনটি প্রসদ্ধি পদের সান্নিধ্যবশতঃ অপ্রসিদ্ধ 'পিক' পদের কোকিলে শক্তিজ্ঞান হয়। সুতরাং দেখা গেল যে উক্ত আটটি উপায়ের দ্বারা পদ-পদার্থের সম্বন্ধাত্মক শক্তিগ্রহ হয়।

এখন প্রশ্ন হল, এই পদ শক্তিটি কার? অর্থাৎ শক্তির আশ্রয় কোথায়? উল্লেখ্য যে, 'শক্তির আশ্রয়' বলতে এখানে কোন পদার্থের সেই নির্দিষ্ট অংশ বা আশ্রয়কে বোঝানো হচ্ছে যা ঐ শক্তির দ্বারা বোধব্য। জাতিশক্তিবাদী মীমাংসক মতে, জাতিই একমাত্র পদের শক্যার্থ, ব্যাক্তি বা আকৃতি নয়-

"জাতাবেব শক্তিগ্রহঃ।"[৮]

অর্থাৎ, মীমাংসক মতে, ঘট পদের দ্বারা 'ঘটত্ব' জাতি অভিহিত হয়। কেননা জাতি ভিন্ন ব্যক্তির অনুভব হতে পারে না। আর মীমাংসক মতে, ব্যক্তির অনুভবের পূর্বে জাতির অনুভব আবশ্যক। কেননা বিশেষন-জ্ঞান না থাকলে বিশিষ্টের জ্ঞান হতে পারে না। অতএব জাতিশক্তিবাদী মীমাংসক মতে, জাতিই পদের শক্যার্থ। এই প্রসঙ্গে জাতিশক্তিবাদী মীমাংসক বলেন, একমাত্র জাতিই পদের শক্যার্থ, ব্যক্তি নয়। অথাৎ তাঁর মতে, গো পদের শক্যার্থ গোত্বজাতি, গো-ব্যক্তি নয়। কেননা তাঁর মতে, ব্যক্তি অসংখ্য হওয়ায় যে বিশেষ ব্যক্তিতে 'গো' পদের শক্তি থাকবে কেবল সেই গো ব্যক্তিই ঐ শক্তি দ্বারা উপস্থিত হবে, আর যে সব ব্যক্তিতে 'গো' পদের শক্তি নেই সেইসব গো-ব্যক্তি ঐ শক্তি দ্বারা উপস্থাপিত হবে না। আর যদি পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা হয় তাহলে গো ব্যক্তি অনন্ত হওয়ায় অনন্ত গো ব্যক্তিতে অনন্ত শক্তি কল্পনা করতে হবে। ফলে মহাগৌরব দোষ হবে। কিন্তু যদি গোত্ব জাতিতে গো পদের শক্তি কল্পনা করা হয় তাহলে উক্ত আপত্তির নিরশন ঘটে। কেননা অনন্ত গো ব্যক্তিতে একটিই গোত্ব জাতি স্বীকৃত হয়ে থাকে। তাই তাঁর মতে, 'গো' পদের শক্যার্থ গোত্বজাতি, গো ব্যক্তি নয়। মণ্ডন মিশ্রের মতে, 'গো' পদের শক্তি গোত্ব জাতিতে স্বীকৃত হলেও 'গোত্ব শক্তং গোপদম' এই আকারে গোত্ব শক্তি প্রকারক গো-পদজ্ঞান থেকে গোত্বমাত্রের উপস্থিতি হওয়ায় 'গোর্জায়তে' অথাৎ উৎপত্তির আশ্রয় 'গো' এবং 'গৌর্নশ্যতি' অথাৎ ধ্বংসের প্রতিযোগী 'গো' এই সকল স্থানে গোত্বের উৎপত্তির বোধক তিবন্ত জন-ধাতুর সহিত এবং বিনাশের বোধক তিবন্ত নাশ-ধাতুর সহিত যখন সাকাক্ষা গো পদের প্রয়োগ করা হয় তখন গো পদের শক্যার্থ যে গোত্ব জাতি তাতে উৎপত্তির আশ্রয়ত্বরূপ 'তে' প্রত্যয়ান্ত জনধাতুর অর্থ এবং নাশ প্রতিযগিত্বরূপ 'তিবন্ত' নাশ ধাতুর অর্থ বাধিত হওয়ায় আন্বয় হতে পারে না। আর এই আন্বয়ের আনুপপত্তির জন্যি জাতিবিশিষষ্ট 'গো' ব্যক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করা উছিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, শাব্দবোধে ব্যক্তির ভান তো সর্বসম্মত অথচ ব্যক্তিতে শক্তি নেই-এটি কীভাবে সম্ভব হতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরে মণ্ডন মিশ্র ব্লেন,অন্য কোন উপায়ে শব্দের অর্থ উপস্থিত না হলে অর্থের উপস্থিতির দ্বারা শাব্দবোধে উক্ত আর্থ শক্তি স্বীকার করা

হয়। অর্থাৎ তাঁর মতে, 'গো' প্রভৃতি পদের স্থলে গো পদার্থের উপস্থিতির জন্য ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ব্যক্তির বোধ লক্ষনার দ্বারাও হতে পারে। কিন্তু গোত্বাদি জাতির বোধ অন্য কোন উপায়ে হয় না বলে গোত্বাদি জাতিতে শক্তি স্বীকার করতে হয়। পুনরায় প্রশ্ন হল, 'গোর্জায়তে', 'গৌর্নশ্যতি' প্রভৃতি স্থলে অন্বয়ের অনুপপত্তি বশতঃ লক্ষণা স্বীকার করলেও 'গাং পশ্যতি' প্রভৃতি স্থলে দর্শন ক্রিয়ার বিষয়তা গো-ব্যক্তির ন্যায় গোত্ব-জাতিতে থাকায় গোত্ববিষয়ক দর্শনাদি ক্রিয়ার যথার্থ শাব্দবোধ হতে পারে। কাজেই এইরূপ স্থলে গো-ব্যক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করার প্রয়োজন কী? উত্তরে মণ্ডন মিশ্র বলেন, 'যষ্টিঃ প্রবেশয়' প্রভৃতি স্থলে অন্বয়ের অনুপপত্তি না থাকলেও তাৎপর্যের অনুপপত্তিকে লক্ষণার বীজ স্বীকার করে লক্ষণার দ্বারা যেভাবে 'যষ্টি' পদ দ্বারা যষ্টিধারীরা বোধিত হয়, অনুরূপভাবে 'গাং পশ্যতি' প্রভৃতি স্থলেও গো-ব্যক্তির দর্শনাদি তাৎপর্যেই এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হয়েছে। অতএব সর্বত্রই গো-পদের গোত্ব জাতিতে শক্তি এবং গোত্ববিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করতে হবে।

নব্য-নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার জাতি অবয়বসংস্থানরূপ আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে গো-পদের একই শক্তি স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হল-

> "পরস্পর বিরুদ্ধ চন্দ্রত্ব সূর্যত্ব উভয় ধর্ম পুরস্কারে যেভাবে 'পুষ্পবন্ত' পদের একটি শক্তি স্বীকৃত হয়, সেভাবে 'গো' প্রভৃতি পদ হতে গবাদিব্যক্তিতে ও গোত্বজাতি এবং সাস্নাদি অবয়বসংযোগবিশেষরূপ আকৃতি -এই উভয় ধর্মাবচ্ছিন্ন একটি শক্তি স্বীকৃত হবে।"[৯]

তাই তিনি মণ্ডনাচার্যের মত খণ্ডন প্রসঙ্গে বলেন, গো-ব্যক্তিকে বর্জন করে কেবল গোত্ব জাতিতে 'গো' পদের মুখ্য প্রয়োগ হতে পারে না। আর যেহেতু গো-ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেবল গোত্ব জাতিতে 'গো' পদের মুখ্য প্রয়োগ হয় না, সেহেতু গোত্বজাতিমাত্রে 'গো' পদের শক্তি কল্পনা করা যায় না। কাজেই কেবল গোত্বজাতি 'গো' পদের শক্য একথা বলা যায় না। আর যদি গোত্বজাতি 'গো' পদের শক্য না হয় তাহলে গোত্ববিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে লক্ষণাও স্বীকৃত হতে পারে না। কেননা ন্যায় মতে,

> "শক্য-সম্বন্ধঃ লক্ষণা"[১০]

অর্থাৎ, লক্ষণা হল শক্যসম্বন্ধ। সুতরাং একমাত্র জাতিই পদের শক্যার্থ জাতিশক্তিবাদী মীমাংসক মণ্ডন মিশ্রের এরূপ মত যথার্থ নয়।

নব্য-নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চাননের মতে, জাত্যাকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকৃত হবে। তাঁর মতে, যদি জাতিতে পদের শক্তি স্বীকার করা হয় তাহলে মীমাংসকদের আরও অধিক গৌরব দোষ স্বীকার করতে হয়। কেননা 'গো' পদের শক্যার্থ যদি 'গোত্ব' জাতি হয় তাহলে শক্যতাবচ্ছেদক হবে গোত্বত্ব। আর এই গোত্বত্ব হল 'গবেতরাসমবেতত্বের সমানাধিকরণ সকল গোসমবেতত্ব' অর্থাৎ গোত্ব গবেতরপ্রাণীতে অসমবেত, কিন্তু সকল গো-ব্যক্তিতে সমবেত। আর গোত্ব-জাতি যেহেতু গো-ভিন্নে অসমবেত অথচ সকল গো-তে সমবেত হয় সেহেতু তার ধর্ম হল গো-ভিন্নে অসমবেতত্ব ও সকল গোসমবেতত্বরূপ গোত্বত্ব। আর এরূপ শক্যতাবচ্ছেদকরূপ গোত্বত্ব সকলগোব্যক্তিঘটিত হওয়ায় জাতিশক্তিবাদী মীমাংসকদের আরও অধিক গৌরব দোষ স্বীকার করতে হয়। তাই *সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী* টীকায় বলেছেন-

> "তস্মাত্ তত্তজ্জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট তত্তদ্ব্যক্তিবোধানুপপত্ত্যা কল্প্যমানা
> শক্তির্জাত্যাকৃতিবিশিষ্টব্যক্তৌ বিশ্রাম্যতীতি"।[১১]

অর্থাৎ, সেই কারণে অর্থাৎ জাতিতে শক্তি স্বীকার করলে, ব্যক্তিতে শক্তি অস্বীকার করলে, এমনটি যদি করা হয় তাহলে সেই জাতি ও আকৃতি অর্থাৎ গলকম্বলাদিরূপ অবয়বসংস্থান -এই দুই বিশিষ্ট সেই সেই ব্যক্তি সম্পর্কিত এই বোধের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আর এই জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কিত বোধের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কল্প্যমান শক্তি জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই বিশ্রান্ত হয়। তাঁর মতে, লক্ষণার দ্বারা ব্যক্তির ভান সম্ভব -মীমাংসক মণ্ডন মিশ্রের এরূপ মত সঙ্গত নয়। কারণ তাঁর মতে, অন্বয় বা তাৎপর্যের অনুপপত্তিরজ্ঞান না হয়েও ব্যক্তির জ্ঞান হতে পারে। যেমন- 'গাম্ আনয়' প্রভৃতি স্থলে গোত্ব জাতির আনয়ন সম্ভব হয় না। আর এই স্থলে গোত্ব জাতির আনয়ন সম্ভব না হওয়ায় অনুপপত্তিবশতঃ গো-পদের গোত্ববিশিষ্টে লক্ষণা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এ স্থলে গোত্ব জাতির আনয়ন

সম্ভব না হওয়ায় অনুপপত্তিবশতঃ গো-পদের গোত্ববিশিষ্টে লক্ষণা স্বীকার করলেও 'গৌরস্তি, তাং পশ্য' অর্থাৎ গরু আছে, তাকে দেখ প্রভৃতি বাক্য থেকে শাব্দবোধ কালে গোত্ব জাতিতে অস্তিত্ব এবং দর্শনকর্মত্বের অন্বয় হতে পারে, যেহেতু গোত্ব জাতি অস্তিত্বের আশ্রয় এবং দর্শনের বিষয় হতে পারে। ফলে এ স্থলে অন্বয়ানুপপত্তিরূপ লক্ষণার বীজ থাকে না। আর এ স্থলে অন্বয়ানুপপত্তিরূপ লক্ষণার বীজ না থাকায় জাতিশক্তিবাদী মীমাংসকের মতানুযায়ী গোত্ববিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করা যায় না। আবার ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করলে ব্যক্তি অনন্ত হওয়ায় অনন্ত শক্তি কল্পনায় গৌরব দোষ হবে -মীমাংসকের এরূপ অনুযোগও সঙ্গত নয়। কারণ ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হলেও ঈশ্বরেচ্ছারূপ শক্তি এক ও ব্যক্তিভেদে অভিন্ন এবং তা জাত্যাবচ্ছিন্নে থাকায় তা প্রতি ব্যক্তিতেও থাকে। ফলে এ স্থলে আর গৌরব হয় না। আবার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে-

> "ইহাতে অননুগমও অর্থাৎ অনুগত প্রবৃত্তিনিমিত্তের অভাবও হয় নাই, কারণ গোত্ব প্রভৃতিই অনুগমক আছে"।[১২]

তাই বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের মতে, পদের শক্তি জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে।

উপরিক্ত আলোচনায় দেখলাম যে, প্রায় সব নৈয়ায়িক-ই মহর্ষি গৌতমের 'জাতি, ব্যক্তি ও আকৃতি -এই তিনটিই পদার্থ' এই মত স্বীকার করেছেন। তাই আমরাও মহর্ষি গৌতমের *"ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থাঃ"*[১৩] এই মতকে অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিয়ে পরিশেষে বলতে পারি জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই পদের শক্তি স্বীকার করতে হয়।

তথ্যসূত্র:

১ গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, অন্নংভট্ট বিরচিত, *তর্কসংগ্রহ, অধ্যাপনাসহিত,* , পৃষ্ঠা- ৪৪৪।

২. অন্নংভট্ট বিরচিতঃ *তর্কসংগ্রহঃ ও দীপিকাটীকা* বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, দীপক কুমার বাগচি, পৃষ্ঠা- ১৪৮।

৩. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*, অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা- ২৫২।

৪. অন্নংভট্ট বিরচিতঃ *তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ* নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃষ্ঠা- ৪৪৫।

৫. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*, অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা- ২৩৭।

৬. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*, অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত পৃষ্ঠা- ২৩৮।

৭. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*, অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা- ২৪৮।

৮. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*, অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা- ২৪৯।

৯. কর,শ্রী গঙ্গাধর, *শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা*, পৃষ্ঠা- ৩০১।

১০. অন্নংভট্ট-কৃত তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ-দীপিকা, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, পৃষ্ঠা ২৩৪।

১১. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,* পঞ্চানন শাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা- ৪৩৮।

১২. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,* পঞ্চানন শাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা- ৪৩৭-৪৩৮।

১৩. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*, অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা- ২৫১।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. কর, গঙ্গাধর, '*শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা*', সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৩।

২. গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, 'অন্নংভট্ট বিরচিত: *তর্কসংগ্রহ:অধ্যাপনাসহিত:*', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৪১৩।

৩. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, '*ভারতীয় দর্শন*', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।

৪. তর্কবাগীশ ফণিভূষণ, '*ন্যায়র্শন(গৌতমসূত্র) ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য* (বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত)', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৪।

৫. ভট্টাচার্য্য, করুণা, '*ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন*', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৩।

৬. ভট্টাচার্য্য, শ্রীমোহন ও শাস্ত্রী শ্রীদীনেশচন্দ্র, '*ভারতীয় দর্শনকোষ*', সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৫৮।

৭. মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, 'অন্নংভট্ট-কৃত *তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ-দীপিকা*', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬।

৮. মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র তর্কতীর্থ, আচার্য শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত '*ভাষাপরিচ্ছেদ* (কারিকাবলী ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর সবিশদ বঙ্গানুবাদ)', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

৯. রায় চৌধুরী, অনামিকা কর্তৃক অনুবাদিত, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত '*ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০০৪।

১০. শাস্ত্রী, পঞ্চানন কৃত বঙ্গানুবাদসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন: '*ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ*', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৭৪।